স্মৃতিকথা

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

অনুলিখন

পার্থঘোষ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ ১ ॥

মহাভারতে পড়েছি, আত্মপ্রশংসা আত্মহত্যার সমান। সারাজীবন আমি আত্মপ্রশংসা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। পাছে লিখতে বসলে আত্মপ্রশংসা এসে যায়, তাই আত্মজীবনী লেখায় আমার বরাবরের অনীহা। বহুবার বহুভাবে আত্মজীবনী লেখার প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু এড়িয়ে গেছি। এবার অনুজপ্রতিম বরুণ সেনগুপ্ত আগ্রহ দেখানোয় আমি আর বিমুখ থাকতে পারলাম না। বাধ্য হয়ে সম্মত হয়েছি।

শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো। আমার এই স্মৃতিচারণে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি ঘটে যায় কিংবা অতীতের সত্য তুলে ধরতে গিয়ে কাউকে আঘাত দিয়ে বসি, তবে তা অনিচ্ছাকৃত বলে মনে করবেন। আমি শুরুতেই সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

স্মৃতিচারণধর্মী এই ধরনের লেখায় দিনলিপি বা ডায়েরি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আমি অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি, এমন কোনো ডায়েরি আমার নেই। কোনোদিন কোনো দিনলিপিও লিখে রাখিনি। ফলে আমায় অতীতচারণ করতে হবে সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে। যে স্মৃতি বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুর্বল হয়ে আসে, আমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বিশেষ করে মানুষজনের নাম এখন প্রায়ই ভুলে যাই।

তবে নাম ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার দুরবস্থা এখনও পদ্মজা নাইডুর মতো হয়নি। সে এক মজার ঘটনা। ওঁরই মুখে শোনা।

তখন পদ্মজা নাইডু রাজ্যপাল। আমরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ কর্মশালার অধিবেশন উপলক্ষে মাঝেমধ্যেই রাজভবনে যাই। একদিন উনি বললেন, আজ একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে। একজন অফিসার এসেছেন কীসব কাগজপত্রে সই করাতে। আমি সই করার জন্য কলমও খুলেছি। কিন্তু সেই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, আমার নাম কী। অফিসারকে যে আমি জিজ্ঞাসা করব — ওহে আমার নাম কী? তাও ভালো দেখায় না। অগত্যা অন্য একটা সাদা কাগজের ওপর হিজিবিজি কাটতে লাগলাম। যেন কলমের কালি পরীক্ষা করছি। কতক্ষণ এমন করেছি, জানি না, হঠাৎ দেখি হিজিবিজির মাঝে একটা নাম ভেসে উঠেছে — পদ্মজা নাইডু। সঙ্গে সঙ্গে সই করে অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

তবে পদ্মজা নাইডুর মতো নিজের নাম আমি কখনও ভুলে যাইনি। এমনকি কথায় আছে, বাপের নাম ভুলে যাওয়া। আমার ক্ষেত্রে তাও ঘটেনি।

দ্বিতীয় আর একটা অসুবিধের কথা বলি। মানুষের জীবনে অনেক জগৎ থাকে। আমারও আছে। পারিবারিক জগৎ, ধর্মীয় জগৎ, শিক্ষার জগৎ, শিল্প ও সাহিত্যসৃষ্টির জগৎ, রাজনৈতিক জগৎ, এমনকি আন্তর্জাতিক জগৎ পর্যন্ত। বহু দেশ আমি ঘুরেছি। সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের যেমন দেখেছি, তেমনি সাধারণ মানুষদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছি। কিন্তু সমস্যা হল — একসঙ্গে এত জগৎ, এত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় করাব?

আমার ইচ্ছা, এই স্মৃতিচারণে আমি নিজের কথা কম বলার চেষ্টা করব। বরং আমার সময় এবং যেসব বিখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত মানুষকে জীবনে দেখেছি, তাঁদের কথাই তুলে ধরব।

আমার এই স্মৃতিচারণ হবে সমকালীন দেশ-কাল-মানুষকে ঘিরে। স্বদেশ ও স্বজনই হবে আমার প্রতিপাদ্য।

আমি জন্মেছি চন্দ্রবংশে। এই বংশের বাস ছিল বউবাজারে। এখনও একই জায়গায় আছে। আমাদের বংশের বিশেষত্ব হল — আমরা কায়স্থ চন্দ্র। যদিও চন্দ্র পদবিধারী অনেক সুবর্ণবণিকও আছে। আমাদের পাড়াতেই তো বহু সুবর্ণবণিক চন্দ্র থাকেন। অন্যান্য জাতেও চন্দ্র পদবি দেখা যায়।

একবার এই কায়স্থ ও সুবর্ণবণিক চন্দ্র নিয়ে ভোটের আসর সরগরম হয়ে উঠেছিল। সেবার আমি মুচিপাড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। প্রতিপক্ষ বিখ্যাত যতীন চক্রবর্তী মশাই। এই এলাকায় বহু সুবর্ণবণিক মানুষের বাস। তিনি বোধহয় কোনোভাবে অনুমান করেছিলেন, সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সকলে আমায় উজাড় হাতে ভোট দিতে পারে। আমার কানে এল, তিনি প্রচারে বলছেন — আপনারা প্রতাপবাবুকে দেখে যেন সোনার বেনে বলে ভুল করবেন না। উনি খাঁটি কায়স্থ। আমি ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়িতে যাতায়াত করেছি। আমি নিশ্চিত জানি, ওঁরা সোনার বেনে নন।

ওঁর ওই প্রচারের জন্য কিনা জানি না, সেবার আমি মাত্র ৫১৩ ভোটে হেরে গিয়েছিলাম। যদিও আমি কিন্তু সেবার বা তার আগেপরে কখনও জাতের সুবিধে নিয়ে নির্বাচনে লড়িনি। এ নিয়ে কখনও প্রচারও করিনি। কারণ আমি জাতপাত সেভাবে মানি না। আত্মীয়স্বজন, এমনকি আমার পুত্র পর্যন্ত বিদেশিনী বিয়ে করেছে। আমি আপত্তি করিনি। আমার চোখে সমস্ত জাতি সমান। সুবর্ণবণিক সমাজের বহু বার্ষিক সভায় আমি সভাপতিত্ব করেছি। অনেকে আমায় সুবর্ণবণিক বলে ভুলও করে। আমার অবশ্য তাতে কোনো আপত্তি নেই। আমি মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে পারলেই নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।

আমার জন্ম হয়েছিল এমন একটা পরিবারে, যে পরিবার দেশের গঠনমূলক কাজে নানাভাবে, নানা সময় অংশ নিয়েছিল। সেসব কথা আমি পরে বিশদভাবে বলব।

এখন শিকড়ের সন্ধানে ফিরি। আমাদের পরিবার এসেছিল নদীয়া জেলার খিসমা গ্রাম থেকে। একবার কোনো একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বীরনগরে গিয়েছিলাম। সংক্ষেপে যাকে ওলা বলে। কি একটা জয়ন্তী উৎসব ছিল। তখন আমি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। ওখানে গিয়ে শুনি, আমাদের আদি গ্রাম খিসমা ওরই কাছাকাছি। কেমন একটা নাড়ির টান অনুভব করলাম সঙ্গে সঙ্গে। তীব্র কৌতূহলে একটা জিপ নিয়ে পাড়ি দিলাম খিসমা।

ওখানকার স্থানীয় মানুষজন তো আমি এসেছি শুনে ছুটে এলেন। তারপর রীতিমতো মিছিল করে নিয়ে গেলেন একটা বেগুন খেতের সামনে। সেই খেত দেখিয়ে বললেন — এখানেই আপনাদের পারিবারিক বাড়ি ছিল।

দুশো বছর আগের ঘটনা। অতীত স্মৃতি ধুয়েমুছে গেছে সময়ের হাতে। আমি সেই বেগুন খেতের কিছুটা মাটি হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। মনে মনে উচ্চারণ করলাম — ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।

স্থানীয় মানুষজন জড়ো হয়েছিল আগেই। এবার তারা আমার মুখ থেকে কিছু কথা শুনতে চাইল। আমি তাদের নিরাশ করলাম না। ছোটোখাটো একটা সভা হয়ে গেল ওখানে। পাশেই একটা জরাজীর্ণ বাড়ি ছিল। সেখান থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসে অনুরোধ করলেন — আপনি আমার বাড়িতে দু'মুঠো খেয়ে যান। আমি আপনাদের চন্দ্র বংশের মেয়ে। ওঁর অনুরোধও আমি সেদিন ফেলতে পারিনি। হাজার হোক আমাদের আদি গ্রাম।

জানি না কেন, খিসমা গ্রামের যে মর্যাদা প্রাপ্য ছিল, তা কিন্তু পায়নি। খিসমা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মঙ্গলকাব্যেও এই গ্রামের উল্লেখ আছে বলে মোহিত রায় আমাকে জানিয়েছিলেন। আমাদের বংশের মতো আরও বহু বিখ্যাত বংশের বাস ছিল এই গ্রামে। যেমন হাওড়ার রবীন্দ্রলাল সিংহ। তাঁদেরও আদি বাস ছিল এই গ্রামে। রবীন্দ্রলাল সিংহ পরে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, আমাকে নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই শিক্ষামন্ত্রীর আদিবাস ছিল এই খিসমা গ্রাম।

পরিবারের প্রবীণদের মুখে শুনেছি, আমাদের পূর্বপুরুষ নিমাইচরণ চন্দ্র প্রথম খিসমার বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন কুলদেবতা শালগ্রাম শিলা মাথায় করে। সে সময় মারাঠা আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত সারা গ্রামবাংলা। নিমাইচরণের কলকাতা আগমনের হেতুও ছিল ওই আক্রমণের আশঙ্কা। তিনি প্রথম ওঠেন কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রামে। পরে সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যান ১৭৭৬ সালে। কারণ ওই জমি ফাঁকা করে গড়ে ওঠে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ।

আমরা এখন যে অঞ্চলে আছি, ১৮৭১ সালে সেখানে জমির পাট্টা পান আমাদেরই আরেক পূর্বপুরুষ ভারতচরণ। তিনি নিমাইচরণের সন্তান। ইংরেজ সরকারের দেওয়া সেই পাট্টা বা দলিল এখনও আমার কাছে আছে। দুটি ভাষা — বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা সেই দলিল পড়ে জানা যায়, জমিটা আগে ছিল কোনো এক কৈবর্ত্য মালিকের। তার কাছ থেকে জমি নিয়ে পাট্টা দেওয়া হয়েছে।

পুরনো সেই বাড়িকে কেন্দ্র করে পরে আশপাশের অনেক জমি কেনা হয় আমাদের পরিবারের তরফে। এভাবে শহর কলকাতার মতো ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠে আমাদের বাড়ি। পাতলা ইটের ছোটো বাড়ি ক্রমে প্রাসাদে রূপান্তরিত হয়। এই উত্থানের বেশিটা হয়েছিল অবশ্য আমার প্রপিতামহ গণেশচন্দ্রের আমলে।

গণেশচন্দ্র ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত মানুষ। নামজাদা উকিল। প্রথম জীবনে ওঁর গানবাজনার প্রতি তীব্র আসক্তি ছিল। এই গানবাজনার টানেই উনি একবার পাঁচালি গানের দলে যোগ দিয়ে বসেন। ওঁর বাবা ক্রুদ্ধ হন ছেলের অবাধ্যতায়। বাড়ি থেকে বের করে দেন গণেশচন্দ্রকে।

বাবার মতো ছেলেও ছিলেন একবগ্গা জেদি। গান-বাজনা ছেড়ে এবার শুরু করলেন নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা। তবে বাড়িতে ফিরে নয়। এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে। প্রথমে ডাফটন কলেজ থেকে স্নাতক হলেন। তারপর রমানাথ লাহার অধীনে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নিও হন।

শুধু হাইকোর্টে নয়, গণেশচন্দ্র ছোটো আদালত, জেলা আদালত, সর্বত্র ওকালতি করতেন। দেখতে দেখতে তাঁর নামি-দামি অনেক মক্কেল হল। পসার গেল বেড়ে। গণেশ উকিল নামে বিখ্যাত হয়ে গেলেন তিনি।

গণেশ উকিল যে সে-সময় কতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখেও তাঁর নামোচ্চারণে। শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতভাষ্যের আধার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

১৮৮৪ সালের ২৫ জুন। পুণ্য রথযাত্রা তিথিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন ঘটেছে ভক্ত ঈশানের বাড়িতে। বাড়িটি মধ্য কলকাতার ঠনঠনেতে। ঠাকুরের আবির্ভাবে ভক্ত-শিষ্যদের

তারকা হাট বসে গেছে। হাজির হয়েছেন 'মাস্টার' মহেন্দ্রনাথ ছাড়াও প্রিয় শিষ্য নরেন। পিতৃবিয়োগের পর নরেনের পরিবারে নেমে এসেছে চরম অর্থ সংকট। ঠাকুর এই নিয়ে এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন যে ঈশান প্রমুখ ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন নরেনের জন্য একটা কাজ জোগাড় করে দেওয়ার।

ঈশানের বাড়িতে সেদিন ঠাকুরকে সামনে রেখেই চলে শ্লোক পাঠ, ব্যাখ্যা, এমনকি নরেনের কণ্ঠে ঠাকুরের প্রিয় গান। একসময় মাস্টারমশাই ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন শ্রীশের। বলেন, ইনি পণ্ডিত ও অতিশয় শান্ত প্রকৃতির। শিশুকাল থেকে বরাবর আমার সঙ্গে পড়েছেন। এখন ওকালতি করেন।

ওকালতির কথা শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে মন্তব্য করেন — এরকম লোকের উকিল হওয়া। মাস্টার প্রত্যুত্তরে বলেন — ভুলে ওঁর ও পথে যাওয়া। ঠাকুর এরপর মন্তব্য করেন — আমি গণেশ উকিলকে দেখেছি। ওখানে বাবুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যায়।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'ওখানে' বলতে সেদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িকে বুঝিয়েছিলেন। ঠাকুরের এই মন্তব্যেই প্রমাণ মেলে, গণেশ উকিল সে আমলে রানি রাসমণির পরিবারের মামলা-মোকদ্দমা দেখতেন। এমনকি রানির জামাই মযুরবাবুদের সঙ্গে তাঁর এতটাই অন্তরঙ্গতা ছিল যে তাঁদের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির দর্শন করতে যেতেন।

গণেশচন্দ্রের মধ্যে দেশপ্রেম ছিল প্রবল। এই দেশপ্রেমের টানেই তাঁকে অনেক সময় বিভিন্ন মামলা লড়তে হয়েছে। যেমন উপেন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা।

সেবার প্রিন্স অফ ওয়েলস বাঙালি মহিলাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন। রাজার ইচ্ছে পূরণ করতে রাজভক্তদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। উকিল জগদানন্দ রায় তো প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর সংবর্ধনার আয়োজন করলেন নিজের পরিবারের মহিলাদের দিয়ে।

গণেশচন্দ্রের প্রতিবেশী উকিল শ্রীনাথ দাসের দেশভক্ত ছেলে উপেন্দ্রনাথ এ ঘটনায় নিজেকে সামলাতে পারলেন না। জগদানন্দর কীর্তির সমালোচনা করে ব্যঙ্গ প্রহসন লিখে ফেললেন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে। প্রহসন অভিনয়ও হল। কিন্তু ইংরেজ শাসক সহ্য করতে পারল না এই সমালোচনা। পুলিশ দিয়ে বন্ধ করে দিল প্রহসনের অভিনয়।

উপেন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহে সঙ্গী হয়েছিলেন সে আমলের আরেক বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অমৃতলাল বসু। পুলিশ দিয়ে প্রহসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তাঁরা সহ্য করলেন না। উলটে তাঁরা পুলিশী আচরণের সমালোচনা করে আরেক প্রস্থ অভিনয় করলেন 'পোলিস অফ পিগ অ্যান্ড শিপ' এবং 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'। ইংরেজ পুলিশ নেটিভ ভারতীয়দের এই আস্পর্ধা আর সহ্য করল না। সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে গ্রেপ্তার করল উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুকে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল দেশদ্রোহের। বিচারে দুজনের জেল হল।

মামলা এরপর পৌঁছল হাইকোর্টে। ইংরেজদের রোষে পড়ার ষোলো আনা আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও গণেশচন্দ্র কিন্তু অ্যাটর্নি হিসেবে দাঁড়ালেন অভিযুক্তদের সমর্থনে। এই ঘটনার পর থেকে অমৃতলাল বসু আমাদের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। যে ঘনিষ্ঠতা আমিও নিজের চোখে দেখেছি। যথাসময়ে সেকথা বলব। আপাতত ওই ঘটনার পরবর্তী অধ্যায় সম্বন্ধে আলোকপাত করি।

দেশপ্রেমিক উপেন্দ্রনাথ দাসের এই কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অগ্রজপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব দেবনারায়ণ গুপ্ত পরে একটা নাটক লেখেন। পরাজিত নায়ক। এই নাটকে তিনি গণেশচন্দ্ররও চরিত্র রেখেছিলেন। চরিত্রটি মঞ্চে জীবন্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে দেবনারায়ণবাবু

আমাদের বাড়িতে আসেন। গণেশচন্দ্রের আচকান-পাজামা পরা, মাথায় শামলা দেওয়া ছবি দেখে যান। পরে মঞ্চের অভিনয়ে দেখি হুবহু সেই ছবির গণেশচন্দ্রকে উপস্থাপিত করেছেন।

দেশপ্রেমের টানেই গণেশচন্দ্র একসময় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলা-সংক্রান্ত বৈষয়িক বিষয়ের দেখাশোনা করতেন গণেশচন্দ্র। ক্রমে তিনি হয়ে উঠলেন রাষ্ট্রগুরুর সহকর্মী। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যখন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভা গঠিত হল, তখন সভার বিভিন্ন কমিটিতে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন গণেশচন্দ্র। পেশাগত ব্যস্ততার মাঝেই তিনি আলাদা সময় বের করে নিতেন দেশসেবার জন্য। ভারতসভার ইতিহাস থেকে জানা যায়, সাধারণ মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে সে সময় সভার পক্ষ থেকে বিলেতের পার্লামেন্টে একটা দরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল। এই দরখাস্ত রচনার কমিটিতেও ছিলেন তিনি। প্রথিতযশা উকিল হওয়ায় তাঁর ওপরই সহায়তার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। তিনি সে দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনও করেছিলেন।

এরপর ইংরেজ শাসকপক্ষ ভারতীয়দের দমন-পীড়ন নীতির অঙ্গ হিসেবে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট আনল। অর্থাৎ দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ। সারা দেশ জুড়ে এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঝড় বইল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এই অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে সে সময় সভা হয়। গণেশচন্দ্র এসব সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। তাঁর এই দেশভক্তির কারণেই সম্ভবত হরিদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় গণেশচন্দ্রর নাম পরে স্মরণ করেছেন।

বিস্ময়ের কথা, ইংরেজ শাসকদের এভাবে বারবার সমালোচনা করা সত্ত্বেও গণেশচন্দ্রকে কিন্তু লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অর্থাৎ সে আমলের অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য করা হয়েছিল। অবিভক্ত বাংলা বলতে তখন কিন্তু কেবল আজকের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গকে বোঝাত না। বিহার, ওড়িশা, অখণ্ড বাংলা নিয়ে সমগ্র প্রাচ্য ভারত ছিল অবিভক্ত বাংলার অন্তর্গত।

ইংরেজদের মনোনীত হয়ে তাদের আইনসভার সদস্য হলেও গণেশচন্দ্র কিন্তু দেশপ্রেমকে বিসর্জন দিতে পারেননি। ইংরেজদের প্রবর্তিত বিভিন্ন আইনের বিরুদ্ধে বারবার সমালোচনায় মুখর হন। বিশেষ করে চৌকিদারি কর বসানোর যে বিল ইংরেজরা আনলেন, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন গণেশচন্দ্র। তাঁর সেই প্রতিবাদ আইনসভার পুরনো রেকর্ডস-এর মধ্যে পাওয়া যায়। ইংরেজরা যখন দেখল, তাঁকে আর কোনোভাবে বাগে আনা যাচ্ছে না, তখন পুনর্বার মনোনয়ন দিল না। ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গেল গণেশচন্দ্রের আইনসভার জীবন।

গণেশচন্দ্র অবশ্য তাতে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। বরং আইনসভার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে মেতে উঠলেন দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে। সঠিকভাবেই তিনি উপলব্ধি করতে পেয়েছিলেন, শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত না হলে দেশবাসীর পক্ষে কখনও আপন অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া সম্ভব হবে না।

দেশসেবার পাশাপাশি গণেশচন্দ্রর একটা বড়ো গুণ ছিল ধর্মপ্রাণতা। আগেই বলেছি, আমাদের পূর্বপুরুষ নিমাইচরণ শালগ্রাম শিলা মাথায় নিয়ে খিসমা গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। গণেশচন্দ্রর আমলে সেই শালগ্রাম শিলা সকাল-সন্ধে পুজো হত। এখনও এই পুজোর প্রথা আমাদের বাড়িতে প্রচলিত আছে। নিয়মিত পুরোহিত আসেন। ঘণ্টা নেড়ে পুজো হয়।